প্রাচীন বাংলার জনপদ ও রাজনৈতিক ইতিহাস

ইউনিট ৪

প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন খ্রিস্টপূর্ব দেড় হাজার বছর আগে বাংলার প্রাচীন সভ্যতা গড়ে ওঠেছিল অজয় নদীর তীরে। প্রাচীনকালে বাংলা বলতে সমগ্র দেশকে বোঝানো হতো না। এর বিভিন্ন অংশ একাধিক নামে পরিচিত ছিল এবং এই অংশগুলোর ভৌগোলিক অবস্থিতি বহুলাংশে নির্ধারিত হয়েছিল ভূ-প্রকৃতি তথা নদীর স্রোতধারার মাধ্যমে। প্রাচীনকালে বাংলা বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত ছিল এবং এই জনপদবাসীরাই স্ব-স্ব জনপদের নামেই পরিচিতি লাভ করে। পাল আমল থেকে ধারাবাহিকভাবে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায়। তবে গুপ্তদের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অধীনে বাংলাও ছিল একটি প্রদেশ। গুপ্ত শাসনের পর এই দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির জন্ম হয়। এ অবস্থা চলে প্রায় একশ বছর। গোপাল নামে এক নেতা এ অরাজক অবস্থার অবসান ঘটান এবং পাল বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর প্রায় চারশ বছর পর বাংলায় পাল শাসনের অবসান হয় এবং বার শতকের মাঝামাঝি প্রতিষ্ঠিত হয় সেন শাসন।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৪.১ ঃ প্রাচীন বাংলার জনপদ
পাঠ-৪.২ ঃ প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস
পাঠ-৪.৩ ঃ পাল বংশ
পাঠ-৪.৪ ঃ সেন বংশ

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

পাঠ-৪.১ প্রাচীন বাংলার জনপদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশের প্রাচীন জনপদগুলোর নাম বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশের প্রাচীন জনপদগুলোর বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	জনপদ, পুণ্ড্র, রাঢ়, গৌড়, বঙ্গ, সমতট, হরিকেল

প্রাচীন যুগে বাংলা বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত ছিল এবং এই জনপদবাসীরাই স্ব-স্ব জনপদের নামেই পরিচিতি লাভ করে। তবে ভৌগোলিক পরিবেশ একদিকে যেমন প্রাকৃতিক পরিবর্তনের (নদীর ভাঙা-গড়া) সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে ঠিক একইভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তার বা হ্রাসের মাধ্যমে জনপদগুলোর আয়তনও পরিবর্তিত হয়েছে। প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে এসব পৃথক পৃথক অংশগুলো এককথায় 'জনপদ' নামে পরিচিতি লাভ করেছে। জন বা জনগোষ্ঠীর অবস্থান বোঝাতে ব্যবহৃত হয় এই শব্দটি। অর্থাৎ এই জনপদগুলোর অধিকাংশের নামকরণ হয়েছিল প্রাচীন জনগোষ্ঠীর নামানুসারে। প্রাচীন কাল থেকে আরম্ভ করে আনুমানিক ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে প্রাচীন বাংলা পুণ্ড্র, গৌড়, রাঢ়, সূহ্ম, তাম্রলিপি, সমতট, বঙ্গ ইত্যাদি জনপদে বিভক্ত। এই জনপদগুলো স্বতন্ত্র ও পৃথক, মাঝে মাঝে বিরোধ মিলনে একের সাথে অন্যের যোগাযোগের বিষয়টি লক্ষ করা যায়। তবে প্রত্যেকেই যে স্বতন্ত্র সে বিষয়টি প্রায় নিশ্চিত।

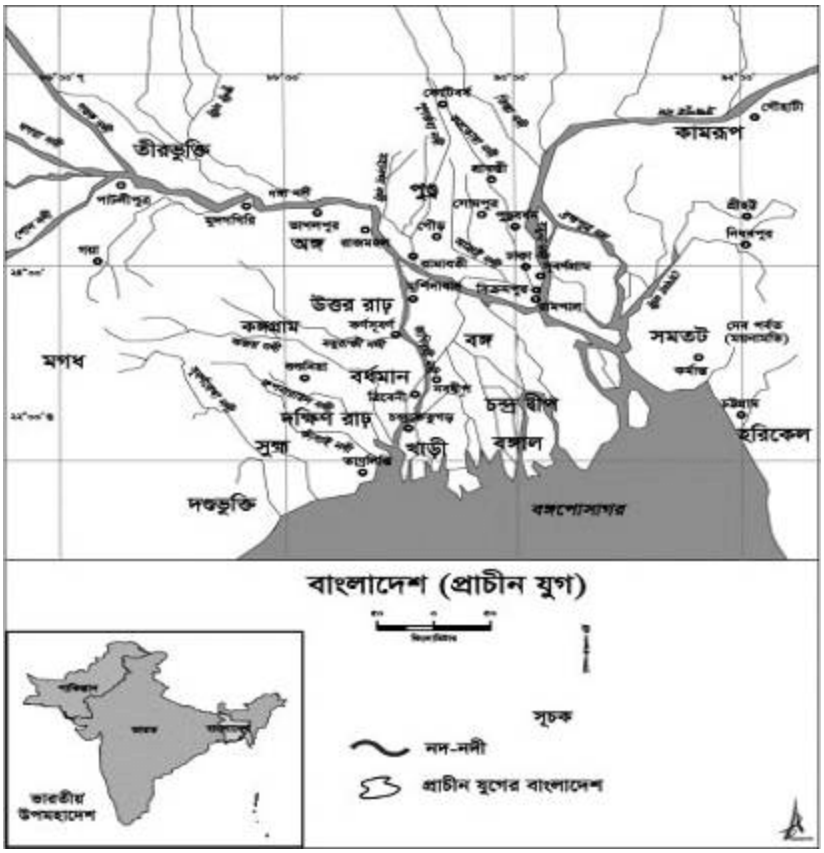

পুণ্ড্র বা বরেন্দ্রী

পুণ্ড্র ছিল পূর্বাঞ্চলের জনপদসমূহের মধ্যে খুব সম্ভবত প্রাচীনতম। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের (আনুমানিক) মহাস্থান ব্রাহ্মী লিপিতে উল্লিখিত পুদনগল (পুণ্ড্র নগর) এবং বগুড়া যে অভিন্ন তা একাধিক উৎস থেকে প্রমাণ করা যায়। প্রাচীন এই জনপদের সীমানা চিহ্নিত করে ড. নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, "পুণ্ড্রবর্ধনের কেন্দ্র বা হৃদয়স্থানের একটি নতুন নাম পাইতেছি দশম শতক হইতে; এ নাম বরেন্দ্র অথবা বরেন্দ্রী।" অর্থাৎ এই প্রাচীন জনপদটি ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে দুটো ভিন্ন নামে পরিচিতি লাভ করেছিল। কতিপয় লিপি প্রমাণে এ কথা বলা যায় যে, বরেন্দ্র পুণ্ড্রবর্ধনেরই অংশবিশেষ। মধ্যযুগের মুসলিম ঐতিহাসিকরা বরেন্দ্রিকে বলতেন বরীন্দ্র। অবশ্য বরেন্দ্র বলতে প্রাচীন বরেন্দ্রিক মতো বিশাল এলাকাকে বুঝাতো না।

রাঢ়, তাম্রলিপ্তি

বিভিন্ন ঐতিহাসিক উৎস থেকে বলা যায় যে, রাঢ় বলতে পশ্চিম বাংলার দক্ষিণাঞ্চলকেই বুঝানো হতো। এটি গঙ্গা নদীর দক্ষিণ ও পশ্চিম ভাগে সীমাবদ্ধ ছিল। জনপদটি দুটি অংশে বিভক্ত ছিল। একটি ছিল দক্ষিণ রাঢ় এবং অন্যটি ছিল উত্তর রাঢ়। এই উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ই ছিল যথাক্রমে বজ্রভূমি ও সূহ্মভূমি। রাঢ়ের প্রধান নগর বা রাজধানী ছিল কোটিবর্ষ। রাঢ় বা সূহ্মদেশের অন্তর্গত তাম্রলিপ্তের কথা টলেমির ভূগোলে উল্লিখিত ছিল । অনেক ঐতিহাসিক মেদিনীপুর জেলার পূর্বপ্রান্ত অবস্থিত আধুনিক তমলুককে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বলে চিহ্নিত করেছেন। শুধু বাংলা নয় এটি প্রাচীন ভারতেরও পূর্বাঞ্চলের শ্রেষ্ঠ বন্দর।

গৌড়

ধারণা করা হয় যে, গুড় উৎপাদনের কেন্দ্র বলে গৌড় নগর ও দেশের নামের উদ্ভব হয়। আর হয়ত এই গৌড়নগরকে ঘিরেই পরে গৌড় জনপদ গড়ে উঠেছিল। 'গৌড়' নামটি সুপ্রাচীন হলেও এর অবস্থিতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা কষ্টসাধ্য। বাংলার প্রাচীন জনপদগুলো যে যুগে যুগে সীমানা সম্প্রসারণ করেছে তার বড় উদাহরণ হলো গৌড়। এই জনপদের খ্যাতি এতই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, সমগ্র বাংলাকেই সময়ে সময়ে গৌড়দেশ বিবেচনা করা হতো।

পূর্ব ভারতীয় দেশসমূহের সামগ্রিক নাম হিসেবে এমনকি উত্তর ভারতের আর্যাবর্তের নাম হিসেবেও কখনো কখনো গৌড়ের ব্যবহার দেখা যায়। সেনবংশীয় রাজারা 'গৌড়েশ্বর' উপাধি গ্রহণ করে গৌরববোধ করতেন। ব্যাপক অর্থে 'গৌড়' বলতে অনেক সময় বাংলা ভাষাভাষী সমগ্র অঞ্চলকে বুঝাত। আদি গৌড়ের রাজনীতিক ক্ষমতার সম্প্রসারণের ফলে এর সীমানা বৃদ্ধি পেতো।

আদিকালে গৌড় বলতে বর্তমানের মুর্শিদাবাদ জেলা ও মালদা জেলার দক্ষিণাংশকে বুঝাত। হিউয়েন সাঙ শশাঙ্ককে কর্ণসুবর্ণ দেশের সম্রাট বলেছেন এবং *হর্ষচরিত* গ্রন্থে শশাঙ্ককে 'গৌড়াধিপতি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কর্ণসুবর্ণ দেশ ও গৌড়দেশ অভিন্ন। গৌড়ের রাজধানী শহর ছিল কর্ণসুবর্ণ। মধ্যযুগের খ্যাতিমান মুসলিম পণ্ডিত আল বেরুনির বিবরণ অনুযায়ী পূর্বভারতের বিভিন্ন দেশের অর্থাৎ বর্তমান বাংলা, উড়িষ্যা, আসামের আদি মধ্যযুগীয় লিপির প্রকৃত রূপ হলো এই "গৌড়ীয় লিপি"। মুসলিম যুগে অঞ্চলটি কখনো 'গৌড়' আবার কখনো লক্ষণাবতী নামে পরিচিত ছিল।

বঙ্গ

বঙ্গ একটি প্রাচীন জনপদ। *ঐতরেয় আরণ্যক* গ্রন্থে একটি উপজাতির নাম হিসেবে বঙ্গের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারত, রামায়ণ ও হরিবংশেও রয়েছে বঙ্গ প্রসঙ্গ। মহাভারতের আদি অন্যান্য জনপদের সাথে উচ্চারিত হয়েছে বঙ্গের নাম। মহাকবি কালীদাসের রঘুবংশ কাব্যে আছে বঙ্গের অবস্থান ও সীমানা সম্পর্কিত কিছু তথ্য। তিনি ভাগীরথী ও পদ্মার স্রোত মধ্যবর্তী এলাকায় যে ত্রিভুজাকৃতি ব-দ্বীপ সৃষ্টি হয়েছে তাকেই বঙ্গদের অঞ্চল বলেছেন। আর এ অঞ্চলই সম্ভবত টলেমির 'গঙ্গরিডাই'। প্রাচীন শিলালিপিতে বঙ্গের দুটি অঞ্চলের নাম পাওয়া যায়। একটি বিক্রমপুর বঙ্গ অন্যটি নাব্য বঙ্গ। বর্তমানে নাব্য বলে কোনো জায়গা নেই। অনুমান করা যায় ঢাকা-ফরিদপুর-বরিশাল এলাকা নাব্য বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাংলায় মুসলমান শাসনামলের প্রাথমিক পর্যায়ে 'বঙ্গ' বলে বাংলার দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব অংশকেই বুঝানো হতো। সুতরাং বঙ্গের এই ভৌগোলিক পরিচিতি হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগ পেরিয়ে মুসলিম যুগের প্রাথমিক পর্যায়েতো বটেই, সম্ভবত 'বাঙ্গালাহ' নামের বিকাশ পর্যন্তই ছিল।

মধ্যযুগের বিখ্যাত মুঘল ঐতিহাসিক আবুল ফজল রচিত *আইন-ই-আকবরী* গ্রন্থে পাওয়া যায় যে, বঙ্গদেশের উত্তরকালীন নাম বঙ্গাল। কারণ এ দেশের প্রাচীন রাজাগণ সারাদেশে চওড়া 'আল' নির্মাণ করতেন। সেজন্যে 'বঙ্গ' ও 'আল' শব্দ দুটির যোগে 'বঙ্গাল' নামের উৎপত্তি হয়েছে। এ থেকে ধারণা করা হয় যে পানি থেকে শস্যক্ষেত রক্ষার জন্য বড় বড় 'আল' বাঁধা হতো এবং তার ফলে এ অঞ্চলটি 'বঙ্গাল' নামে পরিচিত হয়।

সমতট, পট্টিকেরা

দক্ষিণ পূর্ব বাংলার জনপদ সমতট নামটি বর্ণনামূলক এবং এর অর্থ তটের সমান্তরাল। চতুর্থ শতকের সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ লিপিতে তাঁর রাজ্যের পূর্ব সীমায় সমতটের উল্লেখ রয়েছে। কালিদাসের *রঘুবংশ* কাব্যের মাধ্যমে জানা যায় যে, সমতট বঙ্গের পূর্বে অবস্থিত ছিল। সপ্তম শতকে সমতটে এসেছিলেন হিউয়েন সাঙ। তিনি বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিদ্যমান অবস্থার যে বর্ণনা রেখে গেছেন তা থেকে বোঝা যায় যে, কুমিল্লার লালমাই অঞ্চলই সমতট। মূলত মেঘনা-পূর্ববতী অঞ্চলই সমতট বলে পরিচিত ছিল এবং এ অঞ্চলের কেন্দ্র ছিল কুমিল্লার নিকটবর্তী 'লালমাই' এলাকা। একেবারে সঠিকভাবে সমতটের সীমা নির্ধারণ না করা গেলেও ত্রিপুরা (কুমিল্লা) ও নোয়াখালী অঞ্চলই ছিল সম্ভবত প্রাচীন সমতট।

হরিকেল

হরিকেল জনপদের কথা প্রথম জানা যায় প্রথম শতকের চট্টগ্রামে প্রাপ্ত লিপিতে। চন্দ্রবংশীয় লিপিতেও হরিকেল রাজ্যের কথা আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত দুটি প্রাচীন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে হরিকোল (হরিকেল) ও বর্তমান সিলেট বিভাগ অভিন্ন উলি- খিত হয়েছে। অনেকে ধারণা করেন যে হরিকেল জনপদ ছিল না, এটি বঙ্গের সাথে যুক্ত ছিল।

বাংলাদেশের প্রাচীন জনপদগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষে এ কথা বলা যায় যে, জনপদগুলোর নির্দিষ্ট সীমারেখা নির্ণয় করা বা যুগে যুগে তাদের সীমার বিস্তার ও সংকোচনের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা দুরূহ কাজ। তারপরও প্রাপ্ত নানা তথ্যের মাধ্যমে আমরা জনপদগুলোর ভৌগোলিক কাঠামো সম্পূর্ণ সঠিক না হলেও আংশিক সঠিকভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছি। রাজনৈতিক, ভৌগোলিক নানা প্রেক্ষাপটে এসব জনপদগুলোয় সবসময়েই চলেছিল ভাঙা-গড়ার খেলা। ভবিষ্যতে হয়ত আরও নানা তথ্যের আবিষ্কার আমাদের সামনে জনপদগুলোর পূর্ণাঙ্গ রূপ তুলে ধরবে।

হিউয়েন সাঙ

আল বেরুনি

টলেমি

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	বৃহত্তর বঙ্গদেশের একটি প্রাকৃতিক মানচিত্রে জনপদসমূহকে আলাদা করে চিহ্নিত করবেন। পাওয়ার পয়েন্টে দেখাবেন।

সারসংক্ষেপ

প্রাচীনকালে বাংলা নির্দিষ্ট কোনো ভূখণ্ড নয় বরং বেশ কয়েকটি জনপদে বিভক্ত ছিল। এগুলো হলো পুণ্ড্র, রাঢ়, গৌড়, বঙ্গ বা বঙ্গাল, সমতট ও হরিকেল। এই জনপদগুলো সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন বংশের শাসনে ছিল। পাল আমলের শাসনের সূচনা পর্যন্ত এ জনপদগুলোর আয়তন বিভিন্ন সময় পরিবর্তিত হতে দেখা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কার বিবরণের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে লালমাই অঞ্চলই "সমতট" জনপদ?
ক) পাণিনী খ) কালিদাস গ) আবুল ফজল ঘ) হিউয়েন সাঙ

২। জনপদের নির্দিষ্ট সীমানা প্রদান কষ্টসাধ্য কেন?
i) পারস্পারিক সংযুক্ততা ii) ভৌগোলিক বিবরণের অপূর্ণতা iii) রাজ্যসীমা বিস্তার বা সংকোচনের ফলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। বঙ্গের অবস্থান বলতে বুঝায়–
i) ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্তী এলাকা ii) বাংলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বাংশ iii) মেঘনা পূর্ববর্তী অঞ্চল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) i ও ii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। বিখ্যাত ঐতিহাসিক রবার্টসন একজন মুঘল শাসকের সভাকবি ছিলেন। তিনি জানান যে প্রাচীনকালে কৃষকরা জমিকে বন্যার ব্যাপকতা থেকে রক্ষার জন্য বাঁধ দিত? (উচ্চতর দক্ষতা)
উদ্দীপকে উল্লিখিত ঐতিহাসিকের প্রদত্ত তথ্যের সাথে আপনার পাঠ্য বইয়ের কোন ঐতিহাসিকের মিল পাওয়া যায়।
ক) শামস সিরাজ আফীফ খ) জিয়াউদ্দিন বারানী গ) আবুল ফজল ঘ) মিনহাজ উস সিরাজ

সৃজনশীল

শার্লিন ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের শিক্ষার্থী। 'O' লেভেল পরীক্ষা শেষে মামার বাড়ি করতোয়ার পাশে বগুড়ার মহাস্থানগড়ে যায়। মামা তাকে নিয়ে সেখানে গড়ে ওঠা প্রাচীনকালের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দেখায় এবং সে সময়কার উজ্জ্বল শাসনামলের ইতিহাস বর্ণনা করেন।

ক. সর্বপ্রথম বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায় কোন গ্রন্থে?
খ. জনপদ বলতে কী বুঝায়? –ব্যাখ্যা করুন।
গ. উদ্দীপকে শার্লিনের পরিদর্শনকৃত এলাকা কোন জনপদের কথা মনে করিয়ে দেয়? বিবরণ দিন।
ঘ. উক্ত জনপদের শাসকদের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল শাসনকাল – মতামত উল্লেখ করুন।

পাঠ-৪.২ প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মৌর্য ও গুপ্ত যুগে বাংলার অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।
- স্বাধীন বঙ্গ রাজ্যের রাজা শশাঙ্ক সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মৌর্য, গুপ্ত, শশাঙ্ক, হর্ষবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রশাসন

মৌর্য ও গুপ্ত যুগে বাংলা

গুপ্ত যুগের আগে বাংলার ধারাবাহিক ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায় না। এ সময়ের ইতিহাস বিষয়ে কিছু উপাদান পাওয়া যায়। যেমন গ্রিক লেখকরা উল্লেখ করেছেন যে, তখনকার বাংলাদেশে 'গঙ্গারিডই' নামে এক শক্তিশালী রাজ্য ছিল। উত্তর বাংলায় মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে (২৬৯-২৩২ খ্রিস্ট পূর্ব)। এলাকাটি মৌর্যদের একটি প্রদেশে পরিণত হয়েছিল। প্রাচীন পুণ্ড্রনগর ছিল এ প্রদেশের রাজধানী। সমগ্র বাংলা শাসনকারী প্রথম সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হলো গুপ্তরা। বিভিন্ন প্রমাণের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, গুপ্তদের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অধীনে বাংলাও ছিল একটি প্রদেশ।

শশাঙ্ক : বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজা

বাংলাদেশের ইতিহাসে শশাঙ্ক ছিলেন প্রথম সার্বভৌম রাজা। তিনি বাংলার বাইরেও রাজ্য জয় করে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শশাঙ্ক উত্তর ভারতের রাজনীতিতেও ভূমিকা পালন করেছিলেন। ড. নীহাররঞ্জনের মতে শশাঙ্ক "স্বতন্ত্র স্বাধীন নরপতিরূপে সুবিস্তৃত রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন।"

শশাঙ্কের প্রাথমিক জীবন ও উত্থান: শশাঙ্কের বংশ বা বাল্যজীবন সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, শশাঙ্ক প্রথম জীবনে স্বাধীন রাজা ছিলেন না, গুপ্ত বংশীয় মহাসেন নামক এক রাজার সামন্ত ছিলেন। শশাঙ্ক কখন এবং কিভাবে গৌড়দেশে সার্বভৌম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন তাও সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে ষষ্ঠ শতকের শেষের দিকে গৌড়ের পরবর্তী গুপ্তবংশীয় রাজাগণ দুর্বল হয়ে পড়েন। এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে শশাঙ্ক সপ্তম শতকের শুরুতে আনুমানিক ৬০৬ সালে গৌড়ে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। স্বাধীন গৌড়রাজ্য বাংলার উত্তর, উত্তর-পশ্চিমাংশ ও মগধে বিস্তৃত ছিল। কর্ণসুবর্ণ ছিল শশাঙ্কের রাজধানী। বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের ১০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত রাঙ্গামাটি নামক স্থানটিই প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ ।

রাজ্য জয় এবং পুষ্যভূতি রাজ্যের সাথে দ্বন্দ্ব: শশাঙ্ক গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করার পর নিজ রাজ্যের সীমা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করেন। তিনি প্রথমে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে দণ্ডভুক্তি (মেদিনীপুর), উৎকল (উত্তর উড়িষ্যা) ও কঙ্গোদ (দক্ষিণ উড়িষ্যা) নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। শশাঙ্কের রাজ্য দক্ষিণে উড়িষ্যার চিল্কা হ্রদ পর্যন্ত ছিল। শশাঙ্ক পশ্চিমে তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলে প্রথমে মগধ ও পরে বারানসী রাজ্য তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করে। ফলে উভয় অঞ্চলই শশাঙ্কের রাজ্যভুক্ত হয়।

শশাঙ্ক উত্তর ভারতের রাজনীতিতেও জড়িত ছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল কনৌজের মৌখরীরাজাদের আক্রমণ থেকে নিজ রাজ্যকে রক্ষা করা। উত্তর ভারতে শশাঙ্কের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন হর্ষবর্ধন। তাই হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্টের রচিত *হর্ষচরিত* ও তার সমসাময়িক হিউয়েন সাঙের বর্ণনায় শশাঙ্কের উত্তর ভারতের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বিবরণ রয়েছে। শশাঙ্কের সাথে রাজ্যবর্ধনের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে রাজ্যবর্ধন নিহত হন । এরপর রাজ্যবর্ধনের ভাই হর্ষবর্ধন রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে শশাঙ্কের উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হন এবং এক বিশাল বাহিনীসহ শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। তবে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে হর্ষবর্ধন যে বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারেননি তা শশাঙ্কের গঞ্জাম তাম্রশাসন থেকেই প্রমাণিত হয়। শশাঙ্ক হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মার হাত থেকে নিজ রাজ্য রক্ষা করতে পেরেছিলেন।

শশাঙ্কের কৃতিত্ব: শশাঙ্ক সনাতন হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। এ কারণেই হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট শশাঙ্ককে বৌদ্ধবিদ্বেষী ও বৌদ্ধ ধর্মের নিগ্রহকারীরূপে চিহ্নিত করেন। শশাঙ্ক সম্পর্কে এ অভিমত সম্পূর্ণ সত্য বলে মনে হয় না। কারণ হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণী থেকে জানা যায় যে, রাজধানী কর্ণসুবর্ণে এবং শশাঙ্কের রাজ্যের অন্যত্র বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট মর্যাদা ছিল।

শশাঙ্ক বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি নিজ প্রতিভা বলে স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তিনি গৌড় রাজ্যকে ভারতের বিহার ও উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। কৌশল ও সামরিক দক্ষতার বলে তিনি তাঁর প্রধান শত্রু

হর্ষবর্ধনের মোকাবিলা করতে গিয়ে নিজ ক্ষমতা ও মর্যাদা রাখতে পেরেছিলেন। শুধু বাংলাদেশের ইতিহাসেই নয়, বরং সপ্তম শতকের ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসেও শশাঙ্ক ছিলেন একজন নামকরা রাজা।

শশাঙ্ক একজন সুশাসক ছিলেন। তিনি কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির উন্নয়নের উদ্যোগ নেন। তার আমলে তাম্রলিপ্ত বন্দর গুরুত্ব লাভ করে। তিনি ৬৩৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর যোগ্য শাসকের অভাবে গৌড়ে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।গোটা বাংলায় নেমে আসে অন্ধকারের যুগ। প্রায় একশ বছর বাংলার ইতিহাসে যে অরাজকতা, নেতৃত্বের শূন্যতার সৃষ্টি হয় তাকে 'মাৎস্যন্যায়' বলা হয়ে থাকে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীরা শশাঙ্ক ও হর্ষবর্ধনের সঙ্গে সংঘটিত যুদ্ধের একটি কাল্পনিক চিত্র আঁকবে।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের ইতিহাসে শশাঙ্ক ছিলেন প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা। নিজ প্রতিভা বলে স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন, তার রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। গুপ্ত বংশের রাজাদের দুর্বলতার সুযোগে শশাঙ্ক সপ্তম শতকের শুরুতে রাজ্য গড়ে তোলেন। তবে তার মৃত্যুর পর নেমে আসে অন্ধকারের যুগ। যোগ্য শাসকের অভাবে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। শশাঙ্কের রাজধানীর নাম কী?
ক) নদীয়া খ) কর্ণসুবর্ণ গ) বিক্রমপুর ঘ) কোটি বর্ষ

২। উত্তর ভারতে শশাঙ্কের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কে ছিলেন?
ক) রাজ্যবর্ধন খ) হর্ষবর্ধন গ) ভাস্করবর্মা ঘ) বাণভট্ট

৩। গৌড় কিসের নাম? (অনুধাবন)
ক) প্রাচীন রাজধানীর খ) প্রাচীন নগরীর গ) প্রাচীন সাহিত্যের ঘ) প্রাচীন জনপদের

উদ্দীপকটি পড়ুন ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
ঢাকার ইম্পেরিয়াল কলেজের ছাত্ররা শিক্ষা সফরে যাচ্ছিল। বাসের সামনের ব্যানারে লেখা ছিল 'চলো যাই বহুদূর সমতট, হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ ও বরেন্দ্র।'

৪। বাসের ব্যানারে যে স্থানগুলোর নাম লেখা ছিল সেগুলো কিসের পরিচয় বহন করে?
ক) পিকনিক স্পট খ) প্রাচীন সভ্যতা গ) দর্শনীয় স্থান ঘ) প্রাচীন জনপদ

৫। উদ্দীপকে উল্লিখিত সমতট স্থানটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (উচ্চতর দক্ষতা)
i) নৌ চলাচলের জন্য উত্তম ii) মেঘনা পূর্ববর্তী অঞ্চল iii) বঙ্গের পূর্বে অবস্থিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) i ও ii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৬। সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে দণ্ডভুক্তি থেকে চিল্কাহ্রদ পর্যন্ত এলাকাকে রাজ্যভুক্ত করেন কে?
ক) হর্ষবর্ধন খ) শশাঙ্ক গ) রাজ্যবর্ধণ ঘ) মহাসেন

সৃজনশীল

কুমিল্লার ইফতেখার সাহেব প্রাচীন বাংলার ইতিহাস জানতে কিছু বই ক্রয় করেন। এর মাধ্যমে তিনি জানলেন পাল রাজাদের আমলে যে জনপদটির বেশি নাম ডাক ছিল তার নানা অজানা তথ্য। এখানে পালদের পূর্ববর্তী একজন শাসক শুধু বাংলায় নয় উত্তর ভারতের রাজনীতিতেও জড়িয়ে পড়েছিলেন এবং সফলও হয়েছিলেন। কিন্তু তার মৃত্যুতে বাংলায় নেমে আসে হতাশার যুগ, দেখা দেয় অরাজকতা।

ক. শশাঙ্ক কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
খ. শশাঙ্ক-কে সুশাসক বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করুন।
গ. উদ্দীপকে পালশাসকদের পূর্ববর্তী শাসকের সাফল্যের সাথে পাঠ্য বইয়ের কোন শাসকের মিল লক্ষণীয়? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. দক্ষ শাসকের অবর্তমানে রাজ্যে সৃষ্টি হয় অরাজকতা – পাঠ্য বইয়ের আলোকে উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

পাঠ-৪.৩ বাংলায় পাল বংশের শাসন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- ধর্মপালের শাসনকালের বিবরণ দিতে পারবেন।
- দেবপালের শাসনামলের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- পাল যুগের গৌরব সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মাৎস্যন্যায়, গোপাল, ধর্মপাল, সোমপুর বিহার, নালন্দা, দেবপাল, মহীপাল

ভূমিকা

প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে পাল রাজবংশ দীর্ঘকাল শাসন করেছে। সুশাসন, জনকল্যাণ, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, উন্নত জীবনবোধ ইত্যাদি বাংলায় সর্বপ্রথম পালরাই প্রতিষ্ঠিত করে। পাল রাজারা বাংলা ও বিহার অঞ্চলে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি থেকে প্রায় চারশ বছর শাসন করেছেন। নৈরাজ্য ও চরম অরাজকতার হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা করে গোপাল নামক এক উচ্চবর্গীয় ব্যক্তি এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্মপাল, দেবপাল, মহিপাল নামে অনেক পাল রাজারা বাংলা শাসন করেছেন।

মাৎস্যন্যায় ও গোপালের উত্থান

শশাঙ্কের পর সপ্তম শতকের মাঝামাঝি থেকে অষ্টম শতক পর্যন্ত বাংলায় বিরাজ করছিল এক অন্ধকার যুগ। বাংলার ইতিহাসে এই সময়টি 'মাৎস্যন্যায়' নামে খ্যাত। মাৎন্যায় একটি সংস্কৃত শব্দ যার অর্থ হল অরাজক পরিস্থিতি। অরাজকতা এবং রাষ্ট্রহীনতার অবসান ঘটিয়ে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পাল বংশের শাসন। শত বছরের হানাহানির অবসান ঘটে যখন গোপাল রাজা হলেন।

মাছের রাজত্বে ছোট, দুর্বল মাছ সবসময় বড় মাছগুলোর গ্রাসে পরিণত হয়। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলা যেন পরিণত হয়েছিল মাছের রাজ্যে। শাসকের অভাবে সবল অত্যাচার করে দুর্বলের ওপর। মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কে মায়া, মমতা, সৌহার্দ্যের যে স্থান তা দখল করে নেয় হিংসা ও দ্বেষ। লামা তারানাথ লিখেছেন, সমগ্র দেশের কোনো রাজা ছিল না। এক চরম অরাজক পরিস্থিতিতে বাংলার ইতিহাসে অনেকটা ধূমকেতুর মতো গোপালের আবির্ভাব হয়। খালিমপুর তাম্রশাসনের বলা হয়েছে যে, মাৎস্যন্যায় দূর করার অভিপ্রায়ে প্রকৃতিগণ গোপালকে রাজা নির্বাচন করেছিলেন। 'প্রকৃতি' শব্দের অর্থ 'জনগণ' বা প্রধান 'কর্মচারী' । সম্ভবত প্রধান কর্মচারীগণ সমবেত হয়ে গোপালকে রাজা নির্বাচন করেন।

অরাজক পরস্থিতিতে গোপালের উত্থান প্রসঙ্গে তারানাথ এক রূপকথার অবতারণা করেছেন। বঙ্গ রাজ্যে উপযুক্ত শাসকের অভাবে জনগণের দুঃখের সীমা ছিল না। এ কারণে সেখানকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা মিলিত হয়ে আইনানুগ শাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে একজন রাজা নির্বাচিত করেন। তবে নির্বাচিত রাজা সে রাতেই নিহত হন এক কুৎসিত, শক্তিশালী নাগ রমণীর হাতে। এরপর সেখানে যত রাজা নির্বাচিত হতেন প্রত্যেককে এই রাক্ষুসীর হাতে মৃত্যুবরণ করতে হতো। যেহেতু একজন রাজা ছাড়া জনসাধারণ তাদের রাজ্য চালাতে পারছিল না, তাই প্রতি সকালে তারা একজন রাজা নির্বাচন করত। এভাবে প্রতিদিন রাজা নির্বাচন ও নিহত হবার ঘটনা ঘটেছিল। অতঃপর চুণ্ডাদেবীর আর্শীবাদ পেয়ে এক ব্যক্তি উপস্থিত হন এমন এক বাড়িতে যে বাড়ির লোকজন দুঃখি ছিল। কারণ সেদিন রাজা হবার দায়িত্ব পড়েছিল ঐ বাড়ির এক ছেলের ওপর। অতিথি সবকিছু কথা শুনে নিজে রাজা হবার কথা বলেন। এতে সেই পরিবার খুবই খুশি হয়। তিনি যেদিন রাজা নির্বাচিত

হন সেদিন মধ্যরাতে সেই রাক্ষুসী উপস্থিত হলে অতিথির হাতে সেই রাক্ষুসীর মৃত্যু ঘটে। পরদিন সকালে লোকেরা তাকে জীবিতবস্থায় দেখে খুবই অবাক হন। তার এ যোগ্যতার জন্যে জনগণ তাকে স্থায়ী রাজারূপে নির্বাচিত করে এবং গোপাল নামে অভিহিত করে।

ধর্মপাল ও উত্তর ভারতে ত্রি-শক্তি সংঘর্ষ

ধর্মপাল হচ্ছেন পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি প্রায় ৪০ বছর রাজত্ব করেন। দীর্ঘ শাসনামলে ধর্মপাল পাল রাজ্যকে একটি সাম্রাজ্যে উন্নীত করেন। ধর্মপাল যখন সিংহাসন আরোহণ করেন তার কিছু আগ থেকেই আর্যাবর্ত তথা উত্তর ভারতে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতা বিরাজমান ছিল। আর্যাবর্তের কেন্দ্রস্থল কনৌজ-এ কোনো রাজশক্তি ছিল না। এই রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণের জন্য অষ্টম শতকের শেষ দিকে পার্শ্ববর্তী শক্তিবর্গের মধ্যে তুমুল লড়াই শুরু হয়। তৎকালীন ভারতের তিনটি প্রধান রাজশক্তি যথা রাজস্থানের প্রতীহার রাজবংশ, বাংলার পাল এবং দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট এক ত্রিপক্ষীয় সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। ধর্মপাল বেশকিছু যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। তবে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। যাহোক, বাংলার ইতিহাসে ধর্মপালই প্রথম রাজা যিনি সর্বপ্রথম উত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে স্বল্পকালের জন্য হলেও কিছু সাফল্য অর্জন করেন। ধর্মপালের সময়ে বাংলা নতুন শক্তি ও উদ্দীপনার প্রতীক হয়েছিল।

মহাস্থানগড়, বগুড়া

সোমপুর মহাবিহার, পাহাড়পুর

শালবন বিহার, কুমিল্লা

ধর্মপাল বৌদ্ধ ছিলেন এবং তিনি অনেক বিহারের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি রাজশাহী বিভাগের বর্তমান নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে সোমপুর মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেন। বরেন্দ্র অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত এই বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ববৃহৎ বৌদ্ধ বিহার। এই জন্যে এটি মহাবিহার নামে পরিচিত। ধর্মপাল বৌদ্ধ ধর্মানুরাগী হলেও তিনি অন্য ধর্ম সম্পর্কে উদার মনোভাব পোষণ করতেন। তিনি হিন্দু দেবতার জন্য মন্দির নির্মাণ করার জন্য ভূমিদান করতেন। ধর্মপালের প্রধানমন্ত্রী গর্গ ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ।

দেবপাল ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

দেবপাল পালবংশের অন্যতম রাজা ছিলেন। তিনি আনুমানিক ৮২১ সালে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি শুধু পিতা ধর্মপালের সাম্রাজ্য রক্ষাই করেননি, বরং সীমানা বৃদ্ধিও করেন। একটি তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, তাঁর সৈন্যবাহিনী বিন্ধ্য পর্বত ও কম্বোজে বিচরণ করেছিল এবং তিনি উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত এবং পূর্বে ও পশ্চিমে সমুদ্রবেষ্টিত ভূভাগ শাসন করেন।

দেবপাল গুর্জের রাজাকে পরাজিত করেন, উড়িষ্যাও জয় করেন। জানা যায় যে, দেবপাল দ্রাবিড় রাজার দর্প চূর্ণ করেন। কেউ কেউ দ্রাবিড় রাজ্য বলতে রাষ্ট্রকূট রাজ্যকে ধরে নেন এবং দেবপালের সাথে রাষ্ট্রকূট রাজের সংঘর্ষের কথা মনে করেন। আরব দেশীয় বণিক ও পর্যটক সুলায়মানের মতে, তখন বাংলা অধিক শক্তিশালী ছিল। দেবপাল সুমাত্রা, জাভা ও বোর্ণিও রাজ্যের রাজাদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। মালয় উপদ্বীপের শৈলবংশীয় রাজা বালপুত্রদেব দেবপালের খ্যাতির কথা জানতে পেরে তাঁর নিকট দূত পাঠিয়েছিলেন। বালপুত্রদেব ইতোমধ্যেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে

একটি মঠ নির্মাণ করেছিলেন। তিনি এর স্থায়ী ব্যয় পরিচালনার জন্য পাঁচটি গ্রাম প্রার্থনা করেন। দেবপাল তাঁর অনুরোধ রক্ষা করেন।

দেবপাল বৌদ্ধ ধর্মের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি মগধের বৌদ্ধ মঠগুলোর সংস্কার সাধন করেন। তিনি নালন্দায়ও কয়েকটি মঠ এবং বুদ্ধগয়ায় একটি বড় মন্দির নির্মাণ করেন। ইন্দ্রগুপ্ত নামক জনৈক বৌদ্ধ শাস্ত্রবিদকে তিনি নালন্দার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। দেবপালের পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে তাঁর শাসনামলে উত্তর ভারতে লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধ ধর্ম পুনরায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠে। বৌদ্ধ ধর্মানুরাগী হলেও দেবপাল অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর মন্ত্রী কেদারমিশ্র ছিলেন একজন উচ্চবর্ণের হিন্দু। দেবপালই ছিলেন যথার্থভাবে পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা এবং তাঁর সময়েই পাল সাম্রাজ্য ক্ষমতা ও গৌরবের শীর্ষ-স্থানে উপনীত হয়।

পাল সাম্রাজ্যের অবনতি (৮৬১-৮৯৫ খ্রি.)

দেবপালের মৃত্যুর পর বাংলার সিংহাসনে কে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন সেই পরিচয় নিয়ে মতভেদ আছে। তথ্য-প্রমাণের অভাবের কারণে সঠিক ধারণা লাভ কঠিন । সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলায় আবিষ্কৃত তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, দেবপালের পুত্র ছিলেন মহারাজাধিরাজ মহেন্দ্রপাল। তিনি প্রায় ১০ বছর রাজত্ব করেছিলেন বলে প্রমাণ রয়েছে। তারপর শাসন করেন নারায়ণ পাল, রাজ্যপাল, দ্বিতীয় গোপাল। তাদের সময় রাজ্যের সীমানা সংকুচিত হয়ে পড়ে।

মহীপাল (৯৯৫-১০৪৩ খ্রিস্টাব্দ) পুনরুদ্ধার, অবনতি ও পাল বংশের পতন

পাল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে দুঃসময়ে বিগ্রহপালের পর তাঁর পুত্র মহীপাল ৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতায় আরোহণ করেন। তিনি কম্বোজ এবং চন্দ্রবংশের হাত থেকে 'অনাধিকৃত বিলুপ্ত' পিতৃরাজ্য যেমন বিহার, উত্তর বাংলা পুনরুদ্ধার করেন। তিনি বারানসী ও সারনাথ পর্যন্ত শক্তি বৃদ্ধি করেন। তবে সেই সময় দাক্ষিণাত্যের চোলরাজ রাজেন্দ্র চোলের আক্রমণে বাংলার স্বাধীনতা প্রায় বিপন্ন হতে বসে। তিনি পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধারে যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দেন। তিনি রাজ্য সম্প্রসারণ ও জনহিতকর কাজ এবং বৌদ্ধ তীর্থস্থানে কীর্তি স্থাপনসহ নানা কাজের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। তাঁর নামে 'মহীপাল গীত' প্রচলিত ছিল।

মহীপালের মৃত্যুর পর পাল রাজ্যে আবার অশান্তি সৃষ্টি হয়। তখন বাইরের শক্তি ক্রমাগত আক্রমণ করত। ফলে শুধু বাংলা নয় বিহারেও পাল রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। দেশের ভেতরেও ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাত বেড়ে যায়। রামপালকেই পাল বংশের 'শেষ মুকুট' বলে অভিহিত করা হয়। যদিও তার মৃত্যুর পর তার দুই পুত্র তৃতীয় গোপাল ও মদনপাল কিছু সময় বাংলার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারা ছিলেন দুর্বল ও অযোগ্য। ফলে বার শতকের শেষ দিকে সেন বংশের উত্থানের ফলে পাল রাজত্বের অবসান ঘটে।

পাল যুগের গৌরব

পাল যুগে বাংলার রাজনীতি যেমন নৈরাজ্য থেকে মুক্ত হয়ে চরম উৎকর্ষতা অর্জন করেছিল তেমনি অর্থনৈতিক জীবনে ধ্বনিত হয়েছিল নবতর স্পন্দন। অন্যদিকে বাংলার ধর্ম, সমাজ এবং সংস্কৃতিতে যে সমন্বয়ের ঐতিহ্য তৈরি হয়েছিল তা ছিল এক শাশ্বত অর্জন। এ সময় বাংলার জনজীবনে হিন্দু-বৌদ্ধদের মধ্যে বিভাজন, হিংসা-দ্বেষ খুব একটা ছিল না। এ যুগে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সাথে বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত হয়, বাংলার সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ে ঐ সব অঞ্চলে। শিল্পকলার ক্ষেত্রে বিকশিত হয় এক নিজস্ব ও অনন্য রীতি। সাহিত্য ও জ্ঞানের অন্যান্য শাখায় উলে- খযোগ্য অগ্রগতি হয়। পালরাই প্রাচীন বাংলার প্রথম দেশজ রাজশক্তি এবং তারাই হচ্ছে আধুনিক বাঙালি জাতি গঠনের প্রাচীনতম সত্তা।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ নওগাঁ জেলায় অবস্থিত সোমপুর মহাবিহারের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি একটি বড় আর্ট পেপারে ছবিসহ উপস্থাপন করবেন। অথবা কম্পিউটারে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীগণ পালবংশ ও সোমপুর মহাবিহারের উপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করবেন।

সারসংক্ষেপ

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলায় যে মাৎস্যন্যায় বা মাছের রাজত্ব চলছিল গোপাল সেই শত বছরের অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে রাজা হন এবং পাল বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। পাল রাজা ধর্মপাল উত্তর ভারতের রাজনীতিতে অংশ নেন। পালযুগে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্ররূপে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রাচীন বাংলার প্রথম দেশজ রাজশক্তি এবং আধুনিক বাঙালি জাতি গঠনের প্রাচীনতম পাল বংশ মহীপালের সময় থেকে দুর্বল হতে থাকে। রামপালকে পাল বংশের শেষ মুকুট বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন রাজবংশ প্রায় চারশ বছর বাংলা শাসন করে?

ক) গুপ্ত খ) মৌর্য
গ) পাল ঘ) সেন

২। ধর্মপাল কোথায় বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেন?

ক) পাহাড়পুরে খ) মহাস্থানগড়ে
গ) কনৌজে ঘ) রাজশাহীতে

৩। কোন শাসককে পালদের মুকুটমনি বলা হয়?

ক) দেবপাল খ) মহীপাল
গ) রামপাল ঘ) মদনপাল

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন

ওমপুর অঞ্চলের রাজা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও তিনি অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি একটি হিন্দু মন্দিরের জন্য ভূমি দান করেন। তার মন্ত্রীও ছিলেন অন্য ধর্মের অনুসারী। এমন নানা গুণের অধিকারী তিনি আমাদের কাছে আজও স্মরণীয়।

ক. পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?
খ. মাৎস্যন্যায় বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা করুন।
গ. উদ্দীপকের রাজার ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের সাথে আপনার পঠিত কোন পাল শাসকের কাজের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. উক্ত শাসকই ছিলেন "পাল বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক" আপনি কী একমত? যুক্তি দিন।

পাঠ-৪.৪ বাংলায় সেন বংশের শাসন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সেন রাজবংশের পরিচয় বলতে পারবেন।
- বিজয় সেনের শাসনকালের বিবরণ দিতে পারবেন।
- বল্লাল সেনের রাজত্বকালের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- লক্ষ্মণ সেনের বিবরণ দিতে পারবেন ।
- বাংলায় সেন রাজবংশের পতন সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	বিজয় সেন, বল্লাল সেন, কৌলিন্য প্রথা, লক্ষ্মণ সেন

ভূমিকা

বাংলার পাল যুগের অবসানের পর বার শতকের দ্বিতীয় ভাগে সেন শাসনের সূচনা হয়। ধারণা করা হয় তারা এদেশে ছিলেন বহিরাগত। সেনদের পূর্বপুরুষদের আদি বাস ছিল দাক্ষিণ্যাত্যের কর্নাটে। বাংলায় সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হেমন্ত সেন । তিনি শেষ বয়সে কর্নাট থেকে এসে রাঢ় অঞ্চলে গঙ্গা নদীর তীরে বসতি স্থাপন করেন। ধারণা করা হয় যে, তিনি পাল রাজা রাম পালের অধীনে একজন সামন্ত রাজা ছিলেন।

বিজয় সেন

বাংলাদেশে বিজয় সেনের সময়ই সেনবংশের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন ১০৯৮ সাল থেকে ১১৬০ সাল পর্যন্ত বাংলায় রাজত্ব করেন। বিজয় সেন সম্ভবত পালরাজা রামপালের রাজত্বকালে রাঢ় অঞ্চলে প্রথমে সামন্তরাজা ছিলেন। বিজয় সেন পালরাজা রামপালকে বরেন্দ্র উদ্ধারে সাহায্য করেছিলেন। এ সাহায্যের প্রতিদানে তিনি রাঢ়ে স্বাধীন ক্ষমতা লাভ করেন। পরবর্তীকালে বিজয়সেন প্রায় সমগ্র বাংলা জয় করে সেনদের ক্ষুদ্র রাজ্যটিকে একটি বড় রাজ্যে পরিণত করেন। এভাবে বিজয় সেন তাঁর সুদীর্ঘ ৬২ বছরের রাজত্বকালে বহু যুদ্ধে জয়লাভ করে প্রায় সমগ্র বাংলাদেশে একক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

বিজয় সেন একজন প্রতিভাবান রাজা ছিলেন। সামান্য একজন সামন্তরাজ হিসেবে জীবন শুরু করে তিনি নিজ প্রতিভা বলে বাংলার সার্বভৌম রাজার স্থান অধিকার করেছিলেন এবং প্রায় সারা বাংলাদেশে নিজ আধিপত্য সুপতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ ছাড়া পালবংশের শাসনাবসানে বাংলাদেশে যে চরম বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দিয়েছিল তা থেকে তিনি বাংলা এবং এর অধিবাসীকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি একজন বীরযোদ্ধা ছিলেন যার সাহস ছিল অপরিসীম; সামরিক দূরদর্শিতা ছিল অতুলনীয়। তিনি পরমেশ্বরও ও মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন।

বিজয় সেন শৈব ছিলেন এবং বৈদিক ধর্মের প্রতিও বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণকে শ্রদ্ধা করতেন এবং তাদেরকে অকাতরে দান করতেন। কবি উমাপতিধর বিজয় সেনের চারিত্রিক গুণাবলির ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বল্লাল সেন

বিজয় সেনের মৃত্যুর পর আনুমানিক ১১৬০ সালে তার পুত্র বল্লাল সেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি রাজ্য জয়ের চেয়ে দেশের ভেতরে উন্নয়ন, নতুন প্রথা চালু ও সংস্কারের কাজে অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। তবে তিনি গোবিন্দপালকে পরাজিত করে মগধের পূর্বাঞ্চল অধিকার করেন। কথিত আছে যে, বল্লাল সেন তাঁর পিতার রাজত্বকালে মিথিলা জয়

করেন। বল্লাল সেন বিদ্যান ও বিদ্যোৎসাহী রাজা ছিলেন। তিনি ব্রতসাগর, আচারসাগর, প্রতিষ্ঠাসাগর, দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর নামে পাঁচটি গ্রন্থ রচনা করেন।

কৌলিন্য প্রথা ও বল্লাল সেন

কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তক হিসেবে বল্লাল সেন ইতিহাসে বিশেষভাবে পরিচিত। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যায় যে, কৌলিন্য প্রথার সাথে বল্লাল সেনের সম্পর্কের তেমন কোনো যুক্তিযুক্ত ভিত্তি নেই। বাংলাদেশে কৌলিন্য প্রথার বহুল প্রচলন দেখা যায় আঠারো ও উনিশ শতকে। ব্রাহ্মণগণ এ প্রথা প্রবর্তনের উদ্যোক্তা ছিলেন। তাঁরা তাঁদের দাবি প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এ প্রথার একটি ঐতিহাসিক ভিত্তি দেখানোর জন্য প্রচার করেন যে, সেন আমলে বল্লাল সেন কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তন করেন। যদি বল্লাল সেন কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তন করতেন, তাহলে তার উল্লেখ সে যুগের সাহিত্য ও লিপিমালায় অবশ্যই থাকত। কিন্তু সেন যুগের সাহিত্য ও লিপিমালায় বল্লাল সেনের কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন বিষয়ে কোনো উল্লেখ নেই।

তবে সেন রাজাদের আমলে সাধারণত সম্মানীয় ব্রাহ্মণদেরকে সমাদর করার উদ্দেশ্যে জমি দান করা হতো। এরূপ জমিপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণদের মধ্যে কয়েকজনের কথাসহ তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। বল্লাল সেন তাঁর পিতার ন্যায় শৈব ছিলেন। ধর্মপ্রচারে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি তাঁর পিতার অন্যান্য উপাধির সাথে 'অরিরাজ নিঃশঙ্কর' উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি আনুমানিক ১৮ বছর রাজত্ব করার পর বৃদ্ধ বয়সে পুত্র লক্ষণ সেনের হাতে রাজ্যভার অপর্ণ করে সস্ত্রীক ত্রিবেণীর কাছে গঙ্গাতীরে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন।

লক্ষ্মণ সেন

বল্লাল সেন ও রমাদেবীর পুত্র লক্ষ্মণ সেন ১১৭৯ সালে প্রায় ৬০ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। লক্ষ্মণ সেন গৌড়, কলিঙ্গ, কামরূপ ও কাশীতে বিজয় অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। ঐতিহাসিক মিনহাজের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, বখতিয়ার খিলজির আক্রমণকালে তিনি আশি বছরের বৃদ্ধ ছিলেন। গৌড় লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালেই পুরোপুরি সেন সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। মগধকে রক্ষা করার জন্যে এবং বাংলাকে আগলে রাখার মানসে লক্ষ্মণ সেন কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তা জানা যায় না।

তবে লক্ষ্মণ সেন নিজ সাম্রাজ্যকে বাইরের শত্রুদের হাত থেকে খুব একটা সুরক্ষিত রাখতে পারেননি। রাজত্বের শেষের দিকে তিনি বার্ধক্যের কারণে বেশ দুর্বলও হয়ে পড়েছিলেন। কারণ তখন রাজ্যের ভেতরে গোলযোগের বিষয়টি ধরা পড়েছিল।

বখতিয়ার খিল্‌জি

তের শতকের প্রথম দিকে, সম্ভবত ১২০৪ সালে বখতিয়ার খিলজি বাংলা আক্রমণ করেন। লক্ষ্মণ সেন তখন নদীয়ায় অবস্থান করছিলেন, দুর্বল লক্ষ্মণ সেন কোনো প্রতিরোধ না করে নদীপথে দক্ষিণপূর্ব বাংলায় চলে যান। এর ফলে উত্তর ও উত্তর পশ্চিম বাংলা বখতিয়ার অধিকার করেন এবং লক্ষ্মণাবতীকে (গৌড়) কেন্দ্র করে বাংলায় মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। লক্ষ্মণ সেনের নদীয়া ত্যাগের মাধ্যমেই বাংলায় হিন্দুশাসনের পতন হয়েছিল বলে ধরা হলেও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় লক্ষ্মণ সেন আরও কয়েক বছর রাজত্ব করেন।

লক্ষ্মণ সেন একজন বিদ্বান ও কবি ছিলেন। তিনি বল্লাল সেনের অসমাপ্ত *অদ্ভুতসাগর* সমাপ্ত করেছিলেন। তিনি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন ও তাঁর রচিত কয়েকটি শ্লোকও পাওয়া গিয়েছে। তাঁর রাজসভায় জ্ঞানী ব্যক্তিবগের সমাবেশ ঘটেছিল। ভারত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হলায়ূধ তাঁর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

লক্ষ্মণসেনের পিতা ও পিতামহ শৈবধর্মের অনুরাগী হলেও তিনি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। পূর্বসূরিদের 'পরম মাহেশ্বর' উপাধির পরিবর্তে তিনি 'পরমবৈষ্ণব' উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর রাজসভায় ভারত বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি জয়দেবের অবস্থান ছিল। তবে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং কৌলীন্য প্রথার জন্যে তাঁর দুর্বলতা ছিল, কৌলীন্যপ্রথা বিস্তারে তিনি ছিলেন সচেষ্ট। তাঁর এ ধরনের মনোভাব সমাজের অন্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভের সঞ্চার করে। তবে লক্ষ্মণ

সেনের দানশীলতা ও ঔদার্য মুসলমান ঐতিহাসিক মিনহাজুদ্দীনকে আকর্ষণ করেছিল। মিনহাজ তাঁর দানশীলতার সুখ্যাতি ও শাসনরীতির প্রশংসা করে তাঁকে হিন্দুস্থানের 'খলিফা স্থানীয়' বলে বর্ণনা করেছেন।

লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যুর পর তার দুই পুত্র বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন কিছুকাল পূর্ব বাংলা শাসন করেন। সেন শাসনামলে সর্বক্ষেত্রে হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সমাজে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। দেখা দেয় অস্থিরতা। অনেকের মতে, ধর্ম সম্পর্কে কট্টর মনোভাব সেনদের পতন তরান্বিত করে এবং এরই সুযোগ নেয় মুসলমানেরা।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ একটি বড় আর্ট পেপারে সেন বংশের রাজাদের পরিচিতিমূলক বিষয় উপস্থাপন করবেন।

সারসংক্ষেপ

বাংলায় পাল যুগের অবসানের পর বার শতকের শেষের দিকে সেন বংশের শাসনের সূচনা হয়। সেন বংশের শাসনের প্রতিষ্ঠাতা হেমন্ত সেন হলেও বিজয় সেনের সময়েই বাংলাদেশে সেন বংশের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সেন বংশের অন্যতম শাসক বল্লাল সেন যিনি কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তন করেন বলে মনে করা হলেও সাম্প্রতিক গবেষণায় অনেকটা অস্বীকার করা হয়েছে। সেন বংশের সর্বশেষ শাসক লক্ষ্মণ সেন ১২০৪ সালে বখতিয়ার খিলজির আক্রমণে নদীয়া ত্যাগ করেন এবং বাংলায় সেন বংশের শাসনের পতন হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

ক) বিজয় সেন খ) হেমন্ত সেন
গ) বল্লাল সেন ঘ) বিশ্বরূপ সেন

২। কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তক হিসেবে পরিচিত কোন শাসক?

ক) হেমন্ত সেন খ) বিজয় সেন
গ) বল্লাল সেন ঘ) কেশব সেন

৩। লক্ষ্মণ সেন নদীয়া ত্যাগ করেন কেন?

ক) পর্যাপ্ত সৈন্যের অভাবে খ) বখতিয়ারের সাহসিকতায়
গ) জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখাত হওয়ায় ঘ) বার্ধক্য ও দুর্বলতার কারণে

৪। লক্ষ্মণ সেন কেমন শাসক ছিলেন?

ক) সুদর্শন খ) সুঠামদেহী
গ) সুপণ্ডিত ঘ) সুগায়ক

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

বৌ বাজারের ভূইয়া বাড়ির লোকেরা শিশুদের খেলার মাঠের খেলাকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের পারিবারিক সমস্যায় প্রতিনিয়ত পারস্পরিক ঝগড়া মারামারিতে লিপ্ত ছিল এমতাবস্থায় বাড়ির বয়স্ক ব্যক্তিরা সমস্যা সমাধানকল্পে একজনকে নেতা হিসেবে মেনে নেয় এবং এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫। উদ্দীপকের ঘটনাটি পাঠ্য বইয়ে প্রাচীন বাংলার কোন শাসকের মৃত্যুর পর ঘটে?
ক) দেবগুপ্ত খ) গোপাল
গ) শশাঙ্ক ঘ) হর্ষবর্ধন

৬। উক্ত ঘটনাটি প্রাচীন বাংলার যে ব্যক্তির শাসকের নির্বাচিত হওয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ–
ক) শশাঙ্ক খ) গোপাল
গ) ধর্মপাল ঘ) মহীপাল

৭। প্রাচীন বাংলার সেন শাসকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? (উচ্চতর দক্ষতা)
i) অরাজকতা থেকে বাংলাকে রক্ষা করা
ii) রাজ্য বিস্তারে অসামান্য অবদান রাখা
iii) বিদ্যা ও বিদ্বানের কদর করা

নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) i ও ii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৮। মুসলিম ঐতিহাসিক মিনহাজ রাজা লক্ষ্মণ সেনের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এর যথার্থ কারণ–
i) তাঁর দানশীলতা
ii) তাঁর সাহসিকতা
iii) তাঁর ঔদার্য

নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক

সেন রাজা	রাজত্বকাল
বিজয় সেন	১০৯৮-১১৬০
বল্লাল সেন	১১৬০-১১৭৮
?	১১৭৯-১২০৬
বিশ্বরূপ সেন	১২০৩-১২০৪

৯। চিহ্নিত স্থানে কোন সেন শাসক রাজত্ব করেন?
ক) হেমন্ত খ) বিজয়
গ) লক্ষ্মণ ঘ) কেশব সেন

১০। ছকের কোন শাসক অদ্ভুত সাগর ও দানসাগর নামে ২টি গ্রন্থ রচনা করেন–
ক) বিজয় খ) বিশ্বরূপ
গ) বল্লাল ঘ) লক্ষ্মণ

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১ ঃ ১. ঘ ২. ঘ ৩. খ ৪. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২ ঃ ১. খ ২. খ ৩. ঘ ৪. ঘ ৫. গ ৬. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩ ঃ ১. গ ২. ক ৩. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৪ ঃ ১. খ ২. গ ৩. ঘ ৪. গ ৫. গ ৬. খ ৭. গ ৮. খ ৯. গ ১০. গ